JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে সমাজ সময় ও মানুষের জীবনসংগ্রাম

পূর্বা শীল, গবেষক,বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

সারসংক্ষেপ

সাহিত্য সমাজজীবনের দর্পণস্বরূপ। সমাজের পরিবর্তনশীল পরিস্থিতি, মানুষের জীবনযাপন, পারস্পরিক সম্পর্ক এবং সময়ের সঙ্গে উদ্ভূত নানা সংকট সাহিত্যের মধ্য দিয়ে প্রতিফলিত হয়। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পে এই সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক প্রকাশ লক্ষ করা যায়। তিনি সমাজকে কেবল বাহ্যিক দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করেননি, বরং তার অন্তর্লোকে প্রবেশ করে মানুষের জীবনসংগ্রাম, মনস্তাত্ত্বিক দ্বন্দ্ব এবং সামাজিক অবস্থানের অন্তর্নিহিত কারণগুলিকে অনুধাবন করেছেন। তাঁর গল্পে একদিকে যেমন অর্থনৈতিক বৈষম্য, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও শ্রেণিগত ব্যবধানের পরিচয় পাওয়া যায়, অন্যদিকে তেমনই আধুনিক নাগরিক জীবনের স্বার্থপরতা, মূল্যবোধের অবক্ষয়, সামাজিক দায়িত্বহীনতা এবং মানবিক সম্পর্কের ক্রমশ পরিবর্তিত রূপও উন্মোচিত হয়েছে। সমাজের এক শ্রেণির মানুষের স্বাচ্ছন্দ্যময় জীবনযাপনের বিপরীতে অন্য শ্রেণির মানুষের অনিশ্চিত অস্তিত্ব ও প্রতিনিয়ত টিকে থাকার সংগ্রাম তাঁর গল্পে বিশেষ তাৎপর্য লাভ করেছে। একই সঙ্গে আধুনিকতার অগ্রগতি সত্ত্বেও মানুষের চিন্তাচেতনার মধ্যে কীভাবে অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার ও সংকীর্ণ মানসিকতা টিকে রয়েছে, তাও তাঁর গল্পের বিষয়বস্তুতে প্রতিফলিত হয়েছে। তাঁর সমাজদৃষ্টিতে কোনো একটি শ্রেণি বা গোষ্ঠী প্রাধান্য পায়নি; বরং সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের জীবন ও অভিজ্ঞতা সমান গুরুত্বে স্থান পেয়েছে। সহজ-সরল বর্ণনার মধ্য দিয়ে সমাজের জটিল বাস্তবতাকে উন্মোচন করার ক্ষমতাই তাঁর গল্পসাহিত্যকে বিশেষ তাৎপর্য প্রদান করেছে।

সূচক শব্দ: সমাজবাস্তবতা, শ্রেণিবৈষম্য, দারিদ্র্য, অর্থনৈতিক সংকট, নাগরিক জীবন, সামাজিক অবক্ষয়, মানবিক মূল্যবোধ, কুসংস্কার, সমাজচেতনা, জীবনসংগ্রাম।

মূল বিষয়

বাংলা সাহিত্যের ভুবনে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় শুধুমাত্র একজন সফল সাহিত্যিক নন বরং তাঁর অসামান্য সৃজনশীল সাহিত্য সাধনার মধ্য দিয়ে তিনি এক স্বতন্ত্র ও কালজয়ী পরিচয় নির্মাণ করেছেন। মূলত সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের শিল্পরূপ ও বিষয়বৈচিত্র্যের দিকে দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, সমকালীন সমাজের অন্তর্লীন বাস্তবতা ও বহুমুখী জীবনপ্রবাহ শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। জীবনের বহুমাত্রিক অভিজ্ঞতা লব্ধ জ্ঞানকে কেন্দ্র করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প সাহিত্যের অভিযাত্রা সূচিত হয়েছে। জীবনের মধুর-তিক্ত অনুভূতি,আলো-অন্ধকারের দ্বন্দ্ব এবং আনন্দ-বেদনার মতো অনুষঙ্গিক দিকগুলো তার গল্পে উদ্ভাসিত হয়েছে।প্রকৃতপক্ষে, মানবজীবনের প্রতিটি পর্যায়েই নানাবিধ বৈপরীত্য, সংকট ও পরিবর্তনের ছাপ সুস্পষ্ট। সেই বিচিত্র জীবনবাস্তবতার নানা দিককে শিল্পসম্মত আঙ্গিকে রূপায়িত করতে এবং তাকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে লেখকের প্রয়োজন হয় কল্পনাপ্রবণ মনন ও সৃজনশীল দৃষ্টিভঙ্গি। তাই প্রত্যেকের পক্ষে প্রকৃত লেখক হয়ে ওঠা সম্ভব নয়; যাঁদের দার্শনিক বোধ তীক্ষ্ণ, অনুভূতি বোধ প্রগাঢ় তারাই কেবল জীবনকে সাহিত্যের দর্পণে মূর্ত করে তোলেন।সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর বহুসংখ্যক ছোটগল্পে যুগের অস্থিরতা, সামাজিক অবক্ষয় ও বিপর্যস্ত জনজীবনের স্বরূপ উন্মোচন করেছেন। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় অবলোকন করা সমাজ ও সময়ের পরিবর্তনকে তিনি কোনোভাবেই উপেক্ষা করতে পারেননি। ফলস্বরূপ তার ছোটগল্পে সমকালীন চেতনা ও সমাজ মননশীলতা সুস্পষ্টভাবে ধরা দিয়েছে।

'সোনামণির অশ্রু'গল্পটি একটি শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে রচিত, যার বয়স ছিল এগারো বছর । এই শিশু মৃত্যুর মর্মান্তিক ঘটনার মধ্য দিয়ে লেখক আধুনিক প্রগতিশীল সমাজের চাকচিক্যের অন্তরালে স্থিত অমানবিকতা, স্বার্থ সর্বস্ব মানসিকতা ও প্রশাসনিক উদাসীনতার নগ্নচিত্র অনবদ্য ভঙ্গিতে গল্পে তুলে ধরেছেন। আপাত দৃষ্টিতে, যে সমাজকে আমরা আধুনিক

প্রগতিশীল ও সভ্য বলে অভিহিত করি সেই সমাজের অভ্যন্তরে যে নৈতিক অবক্ষয়, মূল্যবোধের সংকট ও মানবিক চেতনার অভাব ক্রমশ গভীর হয়ে উঠেছে সোনামনির মৃত্যুর মধ্য দিয়ে লেখক সেই নির্মম বাস্তবতাকে পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন। গল্পের সোনামণি চরিত্রটি একক কোনো শিশু চরিত্র নয়, বরং সে আগামী প্রজন্মের অসংখ্য স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা ও অনাবিষ্কৃত সম্ভাবনার মূর্ত প্রতীক। কিন্তু সমাজের কিছু বিবেকহীন ও আত্মকেন্দ্রিক মানুষের লোভ স্বার্থপরতা ও নৈতিক অধঃপতনের কারণেই অকালে মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়তে হয় এই নিষ্পাপ সোনামণিকে।

গল্পে দেখা যায় , সোনামণি তার মাসির বাড়ি থেকে কাজের মেয়ে বিমলার সঙ্গে সন্ধ্যাবেলা বাড়ি ফিরছিল। বিকেলবেলা বৃষ্টি হওয়ায় জলমগ্ন রাস্তাঘাট এবং তার সঙ্গে চারিদিক অন্ধকারে পরিপূর্ণ কারণ সেই জায়গায় বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়েছে অত্যাধিক বৃষ্টির কারণে। তাই তারা অন্ধকারাচ্ছন্ন পথ ধরে এগিয়ে চলছিল। ফুটপাত পেরিয়ে বড় রাস্তায় নামার সময় জল কাদাময় অন্ধকার রাস্তায় পা ফস্কে সোনামণি উন্মুক্ত নর্দমায় পড়ে যায়। বিমলার চেঁচামেচির কারণটা রাস্তার লোকের বুঝতে অনেক সময় লেগে গেল। অবশেষে দীর্ঘ আড়াই ঘন্টার প্রচেষ্টার পর সোনামনির নিথর দেহ উদ্ধার করা হয়। এভাবে একটি সতেজ ও প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর একটি নিষ্পাপ শিশু তার অনাগত স্বপ্ন, অপ্রকাশিত আকাঙ্ক্ষা, ও অপূর্ণ সাধকে পিছনে ফেলে চিরনিদ্রায় বিলীন হয়ে গেল।এ প্রসঙ্গে সোনামণির মৃত্যুকে কেবল ব্যক্তিগত শোকের ঘটনা হিসেবে দেখলে গল্পটির তাৎপর্য সীমাবদ্ধ হয়ে যায়। বরং এই মৃত্যু আমাদের সামনে একটি বৃহত্তর সামাজিক প্রশ্ন উত্থাপন করে-যে সমাজে একটি শিশুর স্বাভাবিক জীবন ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায় না সেই সমাজকে প্রকৃত অর্থে কতখানি সভ্য প্রগতিশীল বলা যায়?

গল্পের ঘটনা প্রবাহের ক্রমবিকাশে দেখা যায় মৃত সোনামণির অতৃপ্ত আত্মা রাতের অন্ধকারে ঘুরে বেড়ায় তার মৃত্যুর উত্তর খুঁজতে-"ওগো তোমরা আমায় মারলে কেন? আমি কি দোষ করেছি তোমাদের কাছে?"(১)

গল্পের ঘটনা প্রবাহের পরবর্তী পর্যায়ে দেখা যায়, যারা নর্দমার লোহার ঢাকনা তুলে বিক্রি করেছিল সোনামণি সেই ছেলেদের কাছে এর কৈফত চাইলে তারা নিজেদের দায় এড়িয়ে লোহার দোকানের মালিক শিবুবাবুর উপর সমস্ত দোষ চাপিয়ে দেয়। অন্যদিকে আবার শিবুবাবুর কাছে বিষয়টির জবাবদিহি চাইলে তিনিও নিজের দায় স্বীকার না করে প্রশাসনের দিকে অভিযোগের আঙুল তোলেন। এভাবেই প্রত্যেকেই নিজের দায়ভার অন্যের উপর চাপিয়ে দায় মুক্ত হতে চান। এই দুর্ঘটনায় শিকার হওয়া অতৃপ্ত আত্মারা সোনামণির আত্মা হয়ে গল্পে উপস্থিত। তাদের এই অকালে ঝরে যাওয়ার জন্য যারা দায়ী তাদের জবাবদিহি করতে চায়। কেন তাদেরকে এভাবে চলে যেতে হল? কি তাদের অপরাধ? তাদের কি কোন স্বপ্ন ছিল না ভবিষ্যতের? ভদ্রতার মুখোশে নিজেদের প্রকৃত পরিচয় আড়াল করে রাখা মানুষগুলোর অন্তর্নিহিত অপরাধ প্রবণতা কি এত সহজে ধরা পড়ে? তাই-

"ঢেউয়ের মতন অভিমান ঝাপটা দিতে লাগলো তার বুকে। রাত্রির শিশিরের মতন টুপটুপ করে ঝরে পড়তে লাগলো তার চোখের জল।"(২) প্রকৃতপক্ষে সোনামণির মৃত্যুর সঙ্গে বর্তমান ভারতের নগরজীবনের একাধিক বাস্তব ঘটনার আশ্চর্যজনক সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। ২০২৪ সালের ৩ এপ্রিল হরিয়ানার গুরুগ্রামের একটি দুই বছরের শিশু খোলা ম্যানহোলে পড়ে প্রাণ হারায়।

ঠিক তেমনি ২০২৫ সালের ৫ ফেব্রুয়ারি গুজরাটের সুরাটে দুই বছরের এক শিশু খোলা-মেন হলে পরে নিখোঁজ হয় এবং টানা ২৪ ঘন্টা প্রচেষ্টা চালানোর পর তার মৃতদেহ উদ্ধার করা হয়। তাছাড়া এই ২০১৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে অসমের গৌহাটির কালাপাহাড় এলাকায় তিন বছরের শিশু সুমিত সাহু একটি অনাবৃত্ত নর্দমায় পড়ে প্রাণ হারায়। -এই ঘটনাগুলি 'সোনামণির অশ্রু'গল্পের বক্তব্যকে আরো গভীরভাবে তাৎপর্যপূর্ণ করে তুলে। গল্পে যেভাবে দেখা যায় যে সোনামণি উন্মুক্ত নর্দমার শিকার, বাস্তবেও একই ধরনের অব্যবস্থার কারণে শিশুরা প্রাণ হারাচ্ছে। সুতরাং এটা বলা যায় যে সোনামণির মৃত্যু কেবল গল্পের একটি করুণ অংশ নয়, এটি বাস্তব জীবনের এক চরম সত্য ঘটনা ।

তাছাড়া 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প' রচনার পরতে পরতে দারিদ্র্যের করাল গ্রাসে বিপর্যস্ত মানুষের জীবনবাস্তবতা, দুমুঠো অন্নের জন্য কঠোর সংগ্রাম খুবই জীবন্তভাবে লেখক এই গল্পের মধ্যে তুলে ধরেছেন। চরম দারিদ্র্য কিভাবে মানুষের মানবিক মূল্যবোধটুকু ধ্বংস করে দেয় তার এক জ্বলন্ত উদাহরণ হচ্ছে এই গল্পের নিবারণ চরিত্র। একসময়ে যে নিবারণ ছিল পরিমিত অবস্থাপন্ন পরবর্তীতে সেই নিবারণই প্রকৃতির রুদ্ররোষের ফলে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাই গল্পে দেখা যায় বেঁচে থাকার প্রাথমিক শর্তগুলো পূরণ করা তার কাছে এক দুরূহ ও প্রায় অসম্ভব সংগ্রামে পরিণত হয়। শেষে দেখা যায় দারিদ্র্যের এই নির্মম বাস্তবতা তাকে এমন এক পর্যায়ে নিয়ে দাঁড় করায়, যেখানে তার মানবিক মূল্যবোধের ও অবক্ষয় ঘটে।

একদিকে সংসারের দারিদ্র্যের বোঝা অন্যদিকে দীর্ঘদিনের সমাজে প্রচলিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কার বেড়াজাল -এই দুইয়ের দ্বন্দ্ব তার জীবনকে আরো জটিল করে তুলেছে। ভূত কেনাবেচার বিষয়টি কেন্দ্র করে নিবারণ বিশ্বাস করতে শুরু করেছিল যে তার বাবা পবনের মৃত্যুর পর তার বাবার ভূত সে বোতলের মধ্যে বন্ধ করে সুরেনের কাছে দিতে পারলে ১০০ টাকা পেতে পারে এবং সেই ১০০ টাকাই তাদের অনাহার ক্লিষ্ট জীবনের আশ্রয় হয়ে দাঁড়াবে। তাই যখন সে স্বেচ্ছায় তার পিতাকে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দিতে উদ্যত হয় তখন তার পুত্রের প্রতি পিতার করুন আর্তনাদ-

"…. ও বাবা নেবারণ, আমাকে মারিস না, আর দুটো দিন অন্তত বাঁচতে দে, আরো দুটো দিন একটু গরম গরম ভাত দিস্ …. দুটো দিন একটু পেট ভরে খেয়ে যাই …. এক ছিলিম তামাক…..ও বাবা নেবারণ, তোর পায়ে পড়ি…. আর দুটো দিন…একটু গরম ভাত…তোর পায়ে পড়ি…ও বাবা নেবারণ আর দুটো দিন…."(৩)

- গল্পের এই মর্মান্তিক দিকটি পাঠকের হৃদয়ে গভীর বেদনার সঞ্চার করে।

আবার 'উন্মোচনের মুহূর্তে' গল্পে লেখক রেগিং এর মত সমাজের এক কুপ্রথার ভয়াবহ চিত্র অংকন করেন। লেখকের দীর্ঘ জীবনের পর্যবেক্ষণ ও অভিজ্ঞতা ভান্ডারে সঞ্চিত সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি ও স্তরের মানুষের বিচিত্র জীবন কাহিনী তাঁর ছোটগল্পে শিল্পিত রূপ লাভ করেছে। এক্ষেত্রে তাঁর রচনার আড়ালে থেকে যায়নি মেডিকেল বা ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সম্মুখীন হওয়া নির্মম মানসিক ও শারীরিক নিপীড়নের অভিজ্ঞতা। এই কুপ্রথার ফলে অনেক নবাগত শিক্ষার্থীর জীবন অকালে ঝরে যায়, বা কারোর উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন মাঝপথে থেমে যায়।

এই গল্পের মূল কেন্দ্রে রয়েছে মধ্যবিত্ত পরিবারের ছেলে ইন্দ্রজিৎ সরকার। সে অনেক স্বপ্ন নিয়ে ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে আসে। কিন্তু নবাগত এই ছাত্রের প্রতি ধাপে ধাপে কলেজের প্রবীণরা নানাভাবে অপদস্থ ও হেনস্তা করতে থাকেন। এমনকি সে নির্মম শারীরিক নির্যাতনের ও শিকার হয়। যদিও সে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে পেরেছিল। কিন্তু যারা প্রতিষ্ঠান ছেড়ে চলে যায় এই রেগিংয়ের ভয়ে, তাদের স্বপ্ন ও সম্ভাবনাকে ধূলিসাৎ করার দায়ভার কে স্বীকার করবে?

'দূর থেকে দেখা'গল্পে লেখক সুনীল শহর কলকাতার এক ব্যতিক্রমী চিত্র অংকন করেছেন। যেখানে তিনি ওভারব্রিজের নিচে গড়ে উঠা রেল কলোনিকে অবলম্বন করে সমাজের আর্থিক দৈন্যে নিমজ্জিত একশ্রেণীর মানুষের বেঁচে থাকার লড়াইয়ের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তুলেন। এই কলোনিতে আশ্রয় নেওয়া প্রত্যেকটি মানুষই জীবিকাহীনতার, দুবেলা দুমুঠো অন্ন জোগাড়ের এবং সামাজিক অসাম্যতার মধ্য দিয়ে দিন অতিবাহিত করে। তবে তাদের এই বেকারত্বের কারণেই তাদের জীবনধারার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে চুরি, লুন্ঠনসহ নানা অনৈতিক কার্যকলাপ।এই সব কিছুর মূলে রয়েছে অর্থনৈতিক সংকট। কিন্তু মুখ্য বিষয় হচ্ছে যেখানে মানুষের কাছে মৌলিক চাহিদাগুলো পূরণ করা সবচেয়ে বড় সংগ্রাম হয়ে ওঠে, সেখানে ন্যায়বোধ,সততা ও বিবেকবোধের মতো এই শব্দগুলো যেন ক্রমশ ম্লান হয়ে যায়।

তাছাড়া গল্পের পটভূমিতে দেশভাগ পরবর্তী উদ্বাস্তু মানুষের শহরমুখী প্রবণতা এবং নগর জীবনের তাদের অসহায় অবস্থানের পরিচয় পাওয়া যায়। দলে- দলে মানুষের আগমন, শহরের জনসংখ্যার বৃদ্ধি-সামগ্রিকভাবে কলকাতার এক আশঙ্কাজনক সামাজিক বাস্তবতা লেখকের বর্ণনায় ফুটে উঠেছে-

"যেদিকেই চাই, মানুষের চেহারা যেন ক্রমশ রোগা আর বিবর্ণ হয়ে যাচ্ছে মনে হয়। আমাদের বেশ কয়েকজন পুরনো রাঁধুনি,যারা কখনও কখনও বিনা নোটিশে বা মিথ্যে কথা বলে চাকরি ছেড়ে দেশে পালিয়েছে- এখন প্রতিদিনই তাদের একজন দুজন করে ফিরে আসছে দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা থেকে……। যুদ্ধ নেই, দাঙ্গা নেই, তবু কলকাতার সব ফুটপাত রেল স্টেশনে গৃহহারা পরিবারে ভরে যাচ্ছে।…..হাজার হাজার লাখ লাখ কঙ্কালসার মানুষ ধেয়ে আসছে শহরের দিকে।"(৪)

অন্যদিকে জেলখানাকে কেন্দ্র করে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর 'এলাচের কৌটো' গল্পটি লিখেছেন। আমাদের দেশের প্রচলিত আইন ব্যবস্থার নানা অসঙ্গতি ও কারাগরের দুর্বিষহ জীবন-যাপনের এক অত্যন্ত মর্মস্পর্শী চিত্র পাঠকের সম্মুখে তুলে ধরেছেন লেখক।

প্রচলিত সমাজ ধারণা অনুযায়ী, কারাগারে বন্দি প্রত্যেক কয়েদি সমান অপরাধী। কিন্তু প্রকৃত বাস্তব স্বরূপকে গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে লক্ষ্য করা যায়, সব বন্দির অপরাধের নেপথ্যে থাকার কারণ এক নয়। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায়, প্রভাবশালী শ্রেণীর অন্যায় আধিপত্যের ফলে অসহায় মানুষ একসময় প্রতিবাদের ভাষা খুঁজে নিতে বাধ্য হয়। তখন তাদের সেই প্রতিবাদকেই অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয় এবং এই অন্যায় ও অবিচারের বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর তোলা ব্যক্তিকেই কখনো-কখনো অপরাধী চিহ্নিত করে কারাগারের অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়।

গল্পের ঘটনা প্রবাহ যত এগিয়ে চলে, ততই দেখা যায় কোনো- কোনো প্রেক্ষাপটে মুক্তিলাভের আকাঙ্খাকেও ছাপিয়ে প্রতিশোধ গ্রহণ অধিকতর কাম্য বলে প্রতীয়মান হয়।তাই কারামুক্তির সংবাদ মাধবীর মনে যে আনন্দের সঞ্চার করে, তা মূলত স্বাধীন জীবনে ফিরে যাওয়ার আনন্দ নয়, বরং নিজের অপমানের যথোপযুক্ত জবাব দেওয়ার সুযোগ লাভের প্রত্যাশা। বিবাহের প্রতিশ্রুতিকে হাতিয়ার করে যে পুরুষ দিনের পর দিন মাধবীর বিশ্বাস ও আবেগের সুযোগ নিয়ে নিজের লালসা চরিতার্থ করেছে, সেই পুরুষই মাধবীর গর্ভধারণের সংবাদে দায়িত্ব স্বীকারের পরিবর্তে গর্ভপাতের পরামর্শ দিয়ে নিজের স্বার্থপর মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। পরবর্তীতে মাধবী সেই পুরুষটির কথা মানতে নারাজ হলে সে তার উপর অবর্ণনীয় অত্যাচার চালায়। অবশেষে নিরুপায় হয়ে মাধবী তার মায়ের দ্বারস্থ হয়। শেষে সেই পুরুষের মায়ের দ্বারা প্রত্যাখিত হওয়ার পর নিজের প্রতি এই অবিচার সহ্য করতে না পেরে মাধবী সেই মহিলাকে ধাক্কা দিতে বাধ্য হয় এবং ঘটনাস্থলে সেই মহিলার মৃত্যু ঘটে । এই মৃত্যুকে কেন্দ্র করেই শেষ পর্যন্ত কারাগরের অন্ধকার প্রকোষ্ঠেই মাধবীর ঠাঁই হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিচারে যখন জানা যায় যে মৃত্যুর আসল কারণ হচ্ছে হৃদরোগ তখন মাধবী জেল থেকে মুক্তি পায়। কারাগার থেকে মুক্তি লাভ করলেও

তার মনোযোগ থেকে অতীতের অপমান ও লাঞ্ছনার ক্ষত মুছে দিতে পারেনি। বরং সেই অপমানের স্মৃতি তার মধ্যে প্রতিশোধস্পৃহাকে আরো তীব্র করে তুলে। যে পুরুষ তার বিশ্বাস ও আত্মসম্মানকে পদদলিত করেছিল তার অন্যায়ের উপযুক্ত জবাব দিয়ে নিজের হারানো মর্যাদা পুনরুদ্ধার করাই হয়ে উঠে মাধবীর প্রধান আকাঙ্ক্ষা। এমনকি প্রতিশোধ গ্রহণের পর পুনরায় কারাগারে ফিরে আসার ইচ্ছা ও তার মনে কাজ করে। কারণ তার কাছে কারাগারই যেন বাইরের নিষ্ঠুর ও প্রতারণা পূর্ণ সমাজের তুলনায় অধিকতর নিরাপদ আশ্রয়স্থল।

জেল সুপার সুতপার উক্তিতে সমাজে বেশ কিছু নারী অপরাধীদের করুণচিত্র ফুটে উঠে এভাবে -

"এই যে এতগুলো মেয়ে প্রিজনার, এদের প্রায় প্রত্যেকেরই ক্রাইমের সঙ্গে কোন না কোন পুরুষ জড়িত। পুরুষরাই তাদের অপরাধের পথে ঠেলে দেয়। (৫)

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেবল নারীদের অপরাধী পরিচয়ের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখেননি বরং সেই পরিচয়ের নেপথ্যে ক্রিয়াশীল শোষণ, নিপীড়ন, সামাজিক অবিচার ও অসহায়তার স্বরূপও অনুধাবন করেছেন।
আইন যেমন অনেক ক্ষেত্রে অন্ধ, তেমনি আমাদের সমাজব্যবস্থাও কখনো- কখনো অপরাধের বাহ্যিক পরিচয়ের বাইরে অন্তর্নিহিত বাস্তবতাকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়। অপরাধীর পরিচয়ের আড়ালে কারাগারের অন্তরালে বন্দি থাকা নারী কয়েদিদের করুণ জীবনকাহিনী তাদের অসহায়ত্ব, অপমান ,লাঞ্ছনা ও মানসিক যন্ত্রণার কথা -এসব নিয়ে সমাজ খুব কম ভাবিত হয়। তাদের ব্যক্তিগত বেদনা ও জীবন সংগ্রাম অনেকাংশে সমাজের দৃষ্টিসীমার বাইরে থেকে যায় । অথচ একজন নারী কিভাবে সামাজিক শোষণ , প্রতারণা, বঞ্চনা ও প্রতিকূল পরিস্থিতির আবর্তে জড়িয়ে অপরাধ জগতের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়েন সেই অন্তর্নিহিত বাস্তবতা অনুধাবনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাঁর গল্পের মধ্য দিয়ে নারী কয়েদিদের জীবনের সেই অনালোচিত উপেক্ষিত অধ্যায়কে পাঠকের সামনে উন্মোচিত করেছেন। একই সঙ্গে তাদের অপরাধী পরিচয় এর বাইরে গিয়ে মানুষ হিসাবে তাদের যন্ত্রণা অসহায়তা ও জীবন সংগ্রামের নতুন দৃষ্টিকোণ থেকে বিবেচনা করার এক গুরুত্বপূর্ণ অবকাশ সৃষ্টি করেছেন।

অন্যদিকে আবার তাঁর 'শাস্তি'গল্পের মধ্যে দেখা যায় সমাজের এক অন্য রূপ। আধুনিক সভ্যতার অগ্রগতির মধ্যেও সমাজের একাংশ মানুষের মধ্যে নৈতিক মূল্যবোধের চরম অবক্ষয় লক্ষ্য করা যায়। ব্যক্তিগত স্বার্থ ও অর্থলিপ্সার বশবর্তী হয়ে তারা শিশুদের জীবনকে পণ্য সামগ্রীতে পরিণত করে অর্থ উপার্জনের মাধ্যম হিসেবে বেছে নেই।
আবার দারিদ্র্যের নির্মম কষাঘাত কখনো কখনো মানুষকে এমন এক সংকটের মুখে ঠেলে দেয় যেখানে মাতৃত্ব-পিতৃত্বের স্বাভাবিক আবেগ ও জীবিকার কঠিন বাস্তবতার সঙ্গে সংঘাতে জড়িয়ে পড়ে। ক্ষুধার জ্বালা অন্নের অনিশ্চয়তা এবং অর্থনৈতিক বঞ্চনার চাপে কোন-কোন অসহায় পরিবার নিজের সন্তানকেও অন্যের হাতে তুলে দিতে বাধ্য হয় অর্থের বিনিময়ে । এ যেন বেঁচে থাকার তাগিদে মানব জীবনের সবচেয়ে মর্মস্পর্শী সম্পর্কগুলোর এক করুণ বিপর্যয়।

প্রকৃতপক্ষে, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় এমন এক কথাশিল্পী, যিনি অত্যন্ত সহজ, সাবলীল ও স্বাভাবিক বর্ণনাভঙ্গির মধ্য দিয়ে জীবনের গভীরতর সত্যকে পাঠকের সামনে উপস্থাপন করতে সক্ষম। তাঁর গল্প পাঠ করতে গিয়ে পাঠক কখন যে আখ্যানের অন্তর্লোকে প্রবেশ করে চরিত্রগুলির সুখ-দুঃখ, সংকট ও অনুভূতির সঙ্গে একাত্ম হয়ে পড়েন, তা সহজেই অনুভব করা যায়। তাঁর রচনার বিশেষত্ব এখানেই যে, আপাতদৃষ্টিতে সরল ও সাধারণ বর্ণনার অন্তরালে লুকিয়ে থাকে চরিত্রের মনস্তাত্ত্বিক জটিলতা, পারিপার্শ্বিক পরিস্থিতির প্রভাব এবং সময় ও সমাজের গভীরতর বাস্তবতা। সমাজের কোনো ক্ষুদ্র ঘটনাও তাঁর তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণশীল দৃষ্টিকে এড়িয়ে যায় না। জীবনের অতি সাধারণ ঘটনাপ্রবাহের মধ্য থেকেও তিনি অনুধাবন করতে পারেন মানুষের অন্তর্জগতের নানা অপ্রকাশিত অনুভূতি ও সমাজবাস্তবতার বহুমাত্রিক রূপ। তাঁর গল্পের বিষয়বস্তু সমকালীন সমাজ ও সময়ের প্রেক্ষাপটে নির্মিত হলেও তার অন্তর্নিহিত তাৎপর্য চিরকালীন মানবজীবনের সঙ্গে নিবিড়ভাবে সম্পর্কিত। ফলে তাঁর গল্প কেবল নির্দিষ্ট সময়ের সামাজিক আখ্যান হয়ে থাকে না, বরং তা অতিক্রম করে আবহমান মানবজীবনের এক গভীর শিল্পিত ভাষ্য হয়ে ওঠে।আলোচ্য গল্পগুলির পর্যালোচনায় দেখা যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় সমাজের বিচিত্র অসংগতি, অবক্ষয় ও মানবিক সংকটকে ভিন্ন ভিন্ন আখ্যানের মধ্য দিয়ে তুলে ধরেছেন। কোথাও শিশু পাচারের মতো অমানবিক সামাজিক অপরাধের চিত্র, কোথাও উচ্চশিক্ষার প্রতিষ্ঠানে র‍্যাগিংয়ের নামে নবাগত শিক্ষার্থীদের ওপর সংঘটিত নিষ্ঠুর নিপীড়ন, আবার কোথাও ভূতকে কেন্দ্র করে মানুষের দীর্ঘদিনের অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। অন্যদিকে, একটি শিশুর মৃত্যুকে কেন্দ্র করে নর্দমার ঢাকনা চুরি ও বিক্রির মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন কর্মকাণ্ডের যে ভয়াবহ পরিণতি সামনে আসে, তা আধুনিক নাগরিক সমাজের বিবেকহীনতা, প্রশাসনিক উদাসীনতা এবং মানুষের দায়িত্ববোধের অভাবকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করায়। বিষয়ের দিক থেকে গল্পগুলি স্বতন্ত্র হলেও প্রতিটি আখ্যানের অন্তরালে ক্রিয়াশীল রয়েছে সমাজ ও মানুষের প্রতি লেখকের গভীর পর্যবেক্ষণ এবং সংবেদনশীল মনোভাব।সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় কেবল সমাজের অসংগতিগুলিকে চিহ্নিত করেই থেমে থাকেননি; বরং সেই অসংগতির নেপথ্যে ক্রিয়াশীল আর্থসামাজিক পরিস্থিতি, মানুষের মনস্তত্ত্ব, স্বার্থপরতা, অসহায়তা এবং মূল্যবোধের অবক্ষয়ের কারণগুলিকেও শিল্পিতভাবে তুলে ধরেছেন। তাঁর গল্পে শিশু,

কিশোর, শিক্ষার্থী, দরিদ্র, প্রান্তিক মানুষ কিংবা নাগরিক মধ্যবিত্ত—প্রত্যেকেই নিজস্ব জীবনবাস্তবতা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কোথাও ক্ষুধা ও দারিদ্র্য মানুষের নৈতিক অবস্থানকে সংকটাপন্ন করে তোলে, কোথাও ক্ষমতার অপব্যবহার একজন সম্ভাবনাময় শিক্ষার্থীর ভবিষ্যৎকে বিপন্ন করে, আবার কোথাও মানুষের অন্ধবিশ্বাস ও অসচেতনতা জন্ম দেয় মর্মান্তিক পরিণতির। এই বিচিত্র বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে লেখক মূলত মানুষের জীবন, সমাজের পরিবর্তন এবং মানবিক মূল্যবোধের ক্রমবিবর্তনকেই অনুসন্ধান করেছেন।

সবশেষে বলা যায়, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের ছোটগল্পের প্রকৃত সার্থকতা নিহিত রয়েছে তাঁর জীবনঘনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি, সূক্ষ্ম সমাজচেতনা এবং মানবমন অনুধাবনের অসাধারণ ক্ষমতার মধ্যে। তাঁর আখ্যানের পরিসর আপাতদৃষ্টিতে সীমিত হলেও তার অন্তর্নিহিত ব্যঞ্জনা বহুমাত্রিক ও সুদূরপ্রসারী। সাধারণ জীবনের সামান্য ঘটনাকেও তিনি এমন এক শিল্পিত রূপ দিতে সক্ষম, যার মধ্যে পাঠক খুঁজে পান বৃহত্তর সমাজ ও সময়ের প্রতিচ্ছবি। সমকালীনতার সীমা অতিক্রম করে তাঁর গল্পে ধরা পড়ে মানুষের চিরন্তন সুখ-দুঃখ, স্বপ্ন, সংকট, অসহায়তা ও অস্তিত্বের নানা অনুষঙ্গ। তাই সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের গল্প পাঠ কেবল সাহিত্যপাঠের অভিজ্ঞতা নয়, বরং সমাজ ও মানুষকে নতুন করে চিনে নেওয়ার এক বিশেষ উপলব্ধি। সহজ কথনের অন্তরালে গভীর জীবনবোধ, সমকালীন আখ্যানের মধ্যে চিরন্তন মানবসত্যের অনুসন্ধান এবং সাধারণ ঘটনার মধ্যে অসাধারণ তাৎপর্য আবিষ্কারের ক্ষমতাই তাঁকে বাংলা ছোটগল্পের জগতে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে। এভাবেই তিনি তাঁর সাহিত্যকর্মের মধ্য দিয়ে পাঠকের মননে স্থায়ী আসন করে নিয়েছেন।

তথ্যসূত্র

১. 'সুনীলের সেরা ১০১', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রভারতী, কল-৯, ২০০৮, 'সোনামণির অশ্রু'পৃঃ-৪৪৩

২.'সুনীলের সেরা ১০১', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রভারতী, কল-৯, ২০০৮, 'সোনামণির অশ্রু'পৃঃ৪৪৬

৩. 'নির্বাচিত রচনা', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পুনশ্চ, কল-৯,১৯৭২, 'গরম ভাত অথবা নিছক ভূতের গল্প',পৃঃ ৭৬১

৪. গল্প সমগ্র, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, মিত্র ও ঘোষ, কল-৭৩,১৩৯৭ বঙ্গাব্দ, 'দূর থেকে দেখা'পৃঃ২১

৫.'সুনীলের সেরা ১০১', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, পত্রভারতী, কল-৯, ২০০৮, 'এলাচের কৌটো'পৃঃ-৮৮

গ্রন্থপঞ্জি

১. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। সুনীলের সেরা ১০১। পত্রভারতী, ২০০৮।

২. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। গল্প সমগ্র। মিত্র ও ঘোষ। ১৩৯৭।

৩. গঙ্গোপাধ্যায়, সুনীল। নির্বাচিত রচনা। পুনশ্চ, ১৯৭২।

বৈদ্যুতিন তথ্যপঞ্জি-

১.ওয়েবলিঙ্ক

https://pataprokash.com/
%E0%A6%94%E0%A6%AA%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%

E0%A6%BF%E0%A6%95-
%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%B2%E0%A6%BF%E0%A6%A8%E0%A6%BE-
%E0%A6%B9%E0%A7%8B%E0%A6%B8%E0%A7%87%E0%A6%A8%E0%A7%87%E0%A6%B0/

